৯.

জায়গির ব্যবস্থা ও তার সংকট

মুঘল সম্রাট ছিলেন সাম্রাজ্যের রাজস্বের একমাত্র দাবিদার। এই রাজস্বের অধিকার তিনি শাসকশ্রেণির মধ্যে ভাগ করে দিতেন বা বরাত দিতেন। সাম্রাজ্যের রাজস্বের অশি শতাংশ ছিল জায়গির। বাকি কুড়ি শতাংশ খালিসা। খালিসা রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা হত। যেসব এলাকার রাজস্ব সম্রাট বরাত দিতেন সেগুলিকে বলা হয় জায়গির। যারা জায়গির পেত তারা জায়গিরদার। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণির আয়ের প্রধান উৎস ছিল এই জায়গির। জায়গিরদাররা সাধারণত হতেন মনসবদার। সম্রাট তাকে যে মনসব বা পদ দিতেন তার অধিকারী। এই মনসবদাররা হলেন মুঘলদের শাসকশ্রেণি। আকবর এই মনসব ব্যবস্থা গঠন করেন। অধ্যাপক আতহার আলির মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামোয় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল মুঘল শাসকশ্রেণি। এই শাসকশ্রেণির ওপর মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

মুঘল শাসকদের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল সম্পূর্ণ সামরিক ধাঁচের। আর এর প্রধান ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা সকলেই মনসবদার। দশ থেকে দশ হাজারি মনসবদার ছিল। চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজারের সাম্মানিক মনসবদারের কথাও জানা যায়। মনসবদারদের সকলকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। প্রত্যেক মনসবদারকে কিছু সামরিক ও কিছু বেসামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। প্রত্যেকের জন্য সম্রাট দুটি সংখ্যা ধার্য করে দেন। এর একটি 'জাট' অপরটি 'সওয়ার'। এই দুটি সংখ্যা চিহ্নিত পদ সরকারি সংগঠনে তার অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিত। জাট প্রত্যেক মনসবদারের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার সূচক। এই সূচক অনুযায়ী তার বেতন নির্দিষ্ট হত। আর সওয়ার পদ সূচিত করত তিনি কতসংখ্যক সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এই দ্বৈত পদের ভিত্তিতে মনসবদারদের পাওনাগণ্ডা হিসাব করা হত। হিসাব পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত জটিল। জাট পদ সূচিত করত তার ব্যক্তিগত বেতনের পরিমাণ, আর সওয়ার পদের সংখ্যা দিয়ে ঠিক হত সৈন্যসামন্ত দেখাশোনার জন্য কী পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে পাবেন। মনসবদারের বেতন ঠিক করার পর সমপরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় এমন জায়গির তার জন্য নির্দিষ্ট হত। কিছু মনসবদার রাজকোষ থেকে নগদে বেতন পেতেন। তারা হলেন নগদি। তবে বেশিরভাগ মনসবদার

Scanned by CamScanner

রাজস্বের বরাত পেতেন বা জায়গির পেতেন। সরকার রাজস্বের এলাকাগুলি গ্রাম, পরগণা, মহালে ভাগ করে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে ('জমা দামি', দামে নির্দিষ্ট রাজস্ব) মনসবদারদের দিতেন। জায়গিরের নির্ধারিত রাজস্ব বা জমার পরিমাণ হত মনসবদারের নির্দিষ্ট বেতন এবং সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাপ্য অর্থের সমান। এই জায়গিরের ওপর জায়গিরদারদের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকত না। প্রায়ই এক জায়গির থেকে অন্য জায়গিরে তাদের বদলি করা হত। ছয় মাস-এক বছরের মধ্যে অনেকে বদলি হতেন। সাধারণত দুই বা তিন বছর অন্তর মনসবদারদের বদলি করা হত। মুঘল সম্রাটরা ধর্মজ্ঞ, বিদ্বান ও অসাধারণ ব্যক্তিকে অনেক সময় জায়গির দিতেন। এগুলি হল আইমা, মাদাদিমাস, আলতামঘা জায়গির। যারা এগুলি পেতেন সারাজীবন তারা তা ভোগ করতেন, এজন্য তাদের কোনো সেবামূলক কাজ করতে হত না। এদের মৃত্যুর পর এগুলি তাদের পরিবারের লোকদের ভোগ করতে দেওয়া হত। এদেশের কিছু জমিদার, সামন্তরাজা পুরুষানুক্রমে জায়গির ভোগ করত। এদের জায়গিরগুলি কখনও হস্তান্তরিত হত না। এ জায়গিরগুলি 'ওয়াতন' জায়গির নামে পরিচিত। অন্যসব জায়গির তন্‌খা। মুঘল সম্রাটকে আনুগত্য ও সেবা দিয়ে জায়গিরদাররা এগুলি পুরুষানুক্রমে ভোগ করত। সম্রাট ছিলেন মনসবদারদের একমাত্র নিয়োগকর্তা। তিনি তাদের পদোন্নতি ঘটাতে পারতেন, আবার নীচু পদে নামিয়ে দিতেও পারতেন। পদচ্যুত করার অধিকারও তাঁর ছিল। সম্রাট ও মনসবদারদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের (Patron-client) ব্যক্তিগত ও সাময়িক। সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের ওপর এর স্থায়িত্ব নির্ভর করত। সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিয়ত বিস্তার ছিল এর স্থায়িত্বের আবশ্যিক শর্ত। সাম্রাজ্যের শেষপর্বে এর অভাব দেখা দিলে সংকট সৃষ্টি হয়।

মুঘল শাসকশ্রেণির সংখ্যা ছিল খুব সীমিত। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে মোট মনসবদারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮,০০০। একটি হিসাবে দেখা যায়, ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চস্তরের মাত্র ৬৮ জন অভিজাত সাম্রাজ্যের মোট জমার ৩৬.৬ শতাংশ ভোগ করত। পরবর্তী ৫৮৭ জন ভোগ করত ২৫ শতাংশ, বাকি ৭,৫৫৫ জন ভোগ করত ২৫-৩৩ শতাংশ রাজস্ব। এসব পরিসংখ্যান থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল সাম্রাজ্যের সম্পদ মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বড়ো মনসবদাররা জায়গির পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলত (সরকার)। সঙ্গে থাকত তাদের সৈন্যবাহিনী। এরা সাধারণত বিচার করার ক্ষমতা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ভোগ করত। ছোটো মনসবদাররা এসব অধিকার পেত না। এসব কাজের জন্য তাদের এলাকায় সরকার নিযুক্ত কাজি ও ফৌজদার থাকত। জায়গিরদাররা জমিদার ও কৃষকের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। বাকি খাজনার দায়ে এরা জমিদারকে পদচ্যুত করতে পারত। আবার

Scanned by CamScanner

কৃষক চাষ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তাকে জমি চাষ করতে বাধ্য করার অধিকারও তাদের ছিল।

মুঘল শাসকশ্রেণিতে যারা স্থান পেত তাদের বেশিরভাগ ছিল বংশমর্যাদাসম্পন্ন। স্থানীয় রাজপুত, বালুচ ও খোক্কর সর্দাররা এই শ্রেণিতে স্থান পায়। আওরঙ্গজেবের সময় দখিনি ও মারাঠা সর্দাররা এই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে শাসকগোষ্ঠীর বেশিরভাগ ছিল বিদেশি ইরানি, তুরানি ও আফগান। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, ছোটো আমলা ও হাকিম এই শ্রেণিতে স্থান পেয়েছিল। জায়গির পুরুষানুক্রমিক ছিল না। কিন্তু অভিজাতদের বংশধররা এগুলি পেত এবং বহুকাল ধরে এগুলি ভোগ করত। এই শ্রেণি হল জায়গির-নির্ভর খানাজাদ। মুঘল শাসনের শেষপর্বে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের লোক শাসকগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে। কোনো বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী ক্ষমতাশালী হলে শাসকগোষ্ঠীতে তাদের নেওয়া হত। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করার পর আওরঙ্গজেব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দখিনি ও মারাঠাদের শাসকগোষ্ঠীতে স্থান দেন। শাসকশ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর লোক থাকার জন্য সম্রাটদের পক্ষে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হয়। তবে শাসকশ্রেণির সম্প্রসারণের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় খানাজাদরা বা বংশমর্যাদাসম্পন্ন ওমরাহেরা। ওয়াতন ও তন্‌খা মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ঐতিহাসিক কাফি খান এই খানাজাদদের একজন। তিনি দুঃখ করে লিখেছেন যে পায়বাকি (paibaqi) (বণ্টনযোগ্য জায়গির) জায়গিরের সংখ্যা এত কমে গেছে যে খানাজাদদের জায়গিরের জন্য চার থেকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়।

মুঘল মনসবদাররা সাম্রাজ্যের মোট আয়ের ৮২ শতাংশ ভোগ করত। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের হাতে সম্পদের এই প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘল অভিজাতশ্রেণি যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তাকে বলা হয় জায়গিরদারি সংকট। এই সংকট মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। মুঘল সরকার মনসবদারদের যে জায়গির দিত তা থেকে তাদের নির্দিষ্ট বেতন সংগ্রহ করা যেত না। হকিন্সকে যে জায়গির দেওয়া হয়েছিল তা থেকে তার অনুমোদিত বেতনের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় হত। পেলসার্ট লিখেছেন যে কাগজপত্রে যে রাজস্ব নির্ধারণ করা থাকে বরাতি বা জায়গিরদাররা তার মাত্র অর্ধেক আদায় করতে পারে। বিভিন্ন জায়গিরের 'জমা দামি' (দামে নির্ধারিত রাজস্ব) ও আদায়ের মধ্যে ফারাক দূর করার জন্য শাহজাহানের আমলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জায়গিরগুলির জমা ও ওয়াসিল (আদায়) অনুযায়ী বারোমাসি, ছমাসি, চারমাসি, তিনমাসি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। মাসিক অনুপাতও ধার্য হয়ে যায়। স্বাভাবিক সময়ে জায়গিরের

Scanned by CamScanner

রাজস্ব আদায়ের বাড়া-কমার ঝুঁকিটা জায়গিরদারের ঘাড়ে চাপানো হত। এজন্য জায়গিরদার নির্দিষ্ট জায়গির থেকে পুরো রাজস্ব আদায় করতে পারত না। তাকে চার থেকে আট মাসের বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। জায়গিরদার যেহেতু পুরো বেতন পেত না, সে নিয়মমতো পুরো সওয়ার রাখত না। মুঘল সামরিক শক্তির পতন ঘটতে থাকে। এমনকি জায়গিরদারের সামরিক শক্তির এমন অবনমন ঘটে যে সে নিজের জায়গির থেকে ফৌজদারের সাহায্য ব্যতীত রাজস্ব আদায় করতে পারত না। আওরঙ্গজেবের সমকালীন ঐতিহাসিক ভীমসেন লিখেছেন যে তাঁর রাজত্বের শেষদিকে রামসিং হাদা, দলপত বুন্দেলা ও জয়সিংহ কাছওয়া ছাড়া (এরা সকলেই ওয়াতন জায়গিরদার) আর কেউ এক হাজারের বেশি সওয়ার রাখত না।

মুঘলদের এই প্রশাসনিক সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। রাজস্বের হার ছিল খুব উঁচু। কৃষকের হাতে শুধু খোরাকিটুকু রেখে শাসকগোষ্ঠী বাকি সব আত্মসাৎ করেছিল। মুঘল শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারত। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করেও কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হল না। দেখা গেল মনসবদারদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। কৃষির উন্নতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ সমস্যার হয়ত সমাধান করা যেত। মুঘল শাসকশ্রেণি এ সমস্ত উপায়ে সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করেনি তা নয়। সমস্যার সমাধান হয়নি। তাদের ব্যর্থতার আসল কারণ হল শাসকশ্রেণির সংকটের সমাধানের জন্য সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দরকার ছিল। মুঘল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার (জায়গিরদার), জমিদার ও সম্পন্ন কৃষক খুদকস্তদের নিয়ে গঠিত ভারসাম্য। জায়গিরদার এই ভারসাম্য নষ্ট করে গ্রামস্তরে বড়ো রকমের পরিবর্তন আনতে চায়নি। সাধারণ কৃষক, প্রান্তিক চাষি ও ভাগচাষিদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব ঘটানো যেত। এতে উৎপাদন বাড়ত। মুঘল অভিজাতশ্রেণির আর্থ-সামাজিক সংকটের সমাধান হয়তো খুঁজে পাওয়া যেত। জমিদার, খুদকস্ত বা সম্পন্ন কৃষকের স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় কৃষিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি।

আরও কতকগুলি কারণে জায়গিরদারি সংকটের তীব্রতা বেড়েছিল। শাসকশ্রেণির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘল অভিজাতদের একাধিক পত্নী থাকত এবং তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল খুব বেশি। এদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছিল। পশ্চিমি দেশের মতো ভারতেও মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়। বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত রাজপুরুষদের আয় বাড়ানোর প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়ে। শাসকশ্রেণি সঞ্চয়ে অভ্যস্ত ছিল না। শিল্প ও বাণিজ্যে যে তারা একেবারে অনুপস্থিত ছিল তা নয়। তবে শিল্প ও বাণিজ্যের ওপরে এ শ্রেণি নির্ভর করতে পারেনি, অর্থনৈতিক উন্নতির হার ছিল খুব কম। সামগ্রিক গতিহীনতা অবশ্যই ছিল। এই পরিস্থিতিতে জায়গিরের সংখ্যা বেড়ে চলে।

Scanned by CamScanner

জাহাঙ্গির উদারহস্তে জায়গির বিতরণ করেন। খালসা জমির পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৫ শতাংশ। রাজনৈতিক কারণে রাজপুত, মারাঠা ও দাক্ষিণীদের জায়গির দিতে হয়। আওরঙ্গজেব স্বয়ং এক চিঠিতে 'পায়বাকির' অপ্রাচুর্য ও দলে দলে লোকের জায়গিরের জন্য আবেদন জমা দেবার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট বিরক্ত হয়ে ঘোষণা করেন যে তাঁর আর কর্মচারীর প্রয়োজন নেই। তবু তাঁর মন্ত্রী রুহুল্লা খান ও মুখলিস খান তাঁর কাছে জায়গিরদারদের জন্য সুপারিশ করে পাঠাতেন। অনেক খানাজাদ বেজায়গির হয়ে যান। অনেকে বছরের পর বছর জায়গিরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন। এরা পছন্দমতো জায়গির পেত না। সম্রাটের প্রতি এদের আনুগত্য শিথিল হতে থাকে। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের আমলে অবস্থার আরও অবনতি হয়।

সম্রাটের আয় বৃদ্ধির জন্য শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব খালসার আয়তন বাড়িয়ে যান। জাহাঙ্গীরের আমলের ৫ শতাংশ থেকে আওরঙ্গজেব খালসার পরিমাণ বাড়িয়ে করেন জমার ২০ শতাংশ। সম্রাটের মুৎসুদ্দি বাংলার প্রাদেশিক দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান যেসব জমি থেকে সহজে রাজস্ব আদায় হয় (সায়ির হাসিল) বা উর্বর তা খালসায় পরিণত করেন। মনসবদারদের বিদ্রোহপ্রবণ (জোরতলব) অনুর্বর অঞ্চলে জায়গির দেওয়া হয়। জায়গিরগুলিকে জোরতলব বা বিদ্রোহপ্রবণ, আওসাত বা মাঝারি এবং রায়তি এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করে মনসবদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। একজন মনসবদার খানিকটা জোরতলব, খানিকটা আওসাত ও খানিকটা রায়তি অঞ্চল পেত। এই ব্যবস্থায় মনসবদারদের আয় কমে যায়। ভালো জায়গির বা সায়ির হাসিল পাওয়ার জন্য মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। রাজপুত্রদের সামনে রেখে যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কথা আমরা জানি তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভালো জায়গিরগুলি দখল করা। সাম্রাজ্য স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মুঘল শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জায়গির যা ছিল তা বণ্টনের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি দেখা দেয়। বলা যায় জায়গিরদারি সমস্যার মূল বৈশিষ্ট্যটি হল এর ক্রমবর্ধমান অকার্যকারিতা (increasing non-functionality), জায়গিরের অভাব নয়। এর ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়।

জায়গিরদারি ব্যবস্থা আরও এক ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছিল। জায়গিরদারি ব্যবস্থায় জায়গিরদারের ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। সেজন্য সে কৃষির উন্নতির কথা ভাবত না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দিত। মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে তার পক্ষে জায়গিরদার, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হল না। কেন্দ্রীয় শাসন উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে জায়গিরদাররা পুরুষানুক্রমে জায়গিরগুলি ভোগ করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ইজারা ব্যবস্থার

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে বণিক ও মহাজনদের রাজস্বের বরাত দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে। জমিদার ও কৃষকদের ওপর উৎপীড়ন বাড়ে। বার্নিয়ের এই অত্যাচারের বর্ণনা রেখে গেছেন। জমিদার ও সম্পন্ন কৃষক এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ভীমসেনের বর্ণনা অনুযায়ী জমিদারদের ক্ষমতা বেড়েছিল। মুঘল রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি কৃষকদের রক্ষা করতে পারেনি। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। জাঠ, মারাঠা ও রাজপুতদের বিদ্রোহ প্রমাণ করে মুঘল রাষ্ট্র জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে পারেনি। এই সামাজিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুঘলদের আর্থিক ও প্রশাসনিক সংকট। এই সংকট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল।

জমিদারদের সৈন্য ও দুর্গ ছিল। ছিল কৃষকদের সঙ্গে জাতিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পর্ক। জায়গিরদার বা তাদের নিযুক্ত ইজারাদার শোষণের মাত্রা বাড়ালে জমিদাররা কৃষকের পক্ষ নেয়। কৃষি উদ্বৃত্তের অংশ নিয়ে জায়গিরদার ও জমিদারের মধ্যে রেষারেষি ছিল। এবার তা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়। মুঘল মনসবদারদের দাবি কৃষি উদ্‌বৃত্তকে ছাড়িয়ে চাষির গ্রাসাচ্ছাদনে হাত দিলে বিদ্রোহ হয়। এই সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা মুঘল মনসবদারদের ছিল না। মুঘল যুগে বেশিরভাগ কৃষকের অবস্থা ভাল ছিল না। পাইকস্ত ও মুজারিয়ান বা ভাগচাষিদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অবনতি ঘটে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ আছে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ভারতীয় সমাজের নৈতিক অধঃপতন প্রধানত দায়ী ছিল। রাজতন্ত্র, অভিজাতশ্রেণি ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয় সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সতীশ চন্দ্র, ইরফান হাবিব, নোমান আহম্মদ সিদ্দিকি, আতহার আলি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এর অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং অভিজাতশ্রেণির দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। মুঘল জায়গিরদাররা সাম্রাজ্যের রাজস্বের 'সিংহভাগ' দখল করে নেন। কৃষকের ওপর শোষণ হয়। মুঘল সম্রাটরা কৃষি ও কৃষককে এদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারেননি। শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজাতশ্রেণি ও মুঘল সম্রাটরা খানিকটা উদাসীন ছিলেন। এদের জীবনযাত্রার ধরনের জন্য এক ধরনের শিল্প (শৌখিন দ্রব্য ইত্যাদি) নিঃসন্দেহে উৎসাহিত হয়েছিল। মুঘল রাজপুরুষদের অনেকে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লবণ, তামাক, চুন ইত্যাদি একচেটিয়া ব্যবসা থেকে অনেকে বেশ দু-পয়সা কামিয়েছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যেও এদের লগ্নির কথা আমরা জানি। এগুলিকে তাঁরা কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ দেননি। এর তাৎপর্যও তাঁরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেননি। মুঘল মনসবদাররা তাদের জন্য নির্দিষ্ট সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেননি। অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে তাঁরা ব্যর্থ হন।

Scanned by CamScanner

সতীশ চন্দ্র লিখেছেন যে মুঘল যুগে অর্থনীতি ছিল গতিহীন। জায়গিরদারি সংকট শেষ বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সংকট। এ সমস্ত কারণকে প্রাধান্য দিয়েও বলা যায় শাসকশ্রেণির নৈতিক অধঃপতন, উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা, বৈদেশিক আক্রমণ, জাতীয়তাবোধের অভাব, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিমুখ মানসিকতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। জায়গিরদারি সংকট শাসকশ্রেণির সংকট এবং নিঃসন্দেহে আর্থ-সামাজিক সংকট। কিন্তু এই সংকট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ নয়।

Scanned by CamScanner